**বড় নদীর ডেরায়**

অনিতা অগ্নিহোত্রী

একটি মালভূমি, একই রকম পাহাড়শ্রেণি, ঘন মিশ্র জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে রাজ্যের সীমারেখা চলে গেছে বলে আলাদা হয়ে গেছে মানুষের জীবন। সীমারেখার ডানদিকে ওড়িশা, বাঁ দিকে ছত্রিশগড়। সিহাওয়ার পাহাড় থেকে বার হয়ে নুয়াপাড়া মালভূমির অনেকটা সমান্তরাল বহে গিয়ে মহানদী ডানদিকে বেঁকেছে, অর্থাৎ পূর্বমুখী হয়ে ছত্রিশগড়ে সীমা পেড়িয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করেছে। হীরাকুদ জলভাণ্ডারের সেচের জল পেয়েছে সম্বলপুর, সুবর্ণপুর, বরগড়, ঝাড়সুগুডা জেলা। আর নুয়াপাড়া তার অল্পবৃষ্টি মেঘ অনুর্বর মাটি আর দিনযাপনের কষ্ট নিয়ে বসে আছে। অথচ সীমান্তের ঠিক ওপারেই ছত্রিশগড়ে যেখানে মহানদী দক্ষিণ থেকে উত্তরগামিনী হয়েছে, সেই ধারাটিকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি জলভাণ্ডারের মালা তৈরি করা হয়েছে। চাষের জল পেয়ে সবুজ হয়েছে ছত্তিশগড়ের ধমতরী জেলা শহর ছেড়ে পনেরো মাইল দক্ষিণে গেলে গঙ্গারেল জলভাণ্ডার, তার চার কিরোমিটার দূরে রুদ্রী ব্যারেজ। উনিশশো বারো সালে ইংরেজের হাতে তৈরি ব্যারেজের জলে কুলোচ্ছিল না বলে তেইশটি গেট সম্পন্ন নতুন ব্যারেজ হয়েছে। গঙ্গারেলের খুব কাছে মরমশিলি জলভাণ্ডার-এও ইংরেজের তৈরি। এখানে সাইফন পদ্ধতিতে জল যাওয়া আসা করে। আরও দক্ষিণে মহানদীর উপরে দুধওয়া জলভাণ্ডার ও পূর্বে সন্দুর নদীর উপর সন্দুর বাঁধ। এখন জলভাণ্ডারের মেলা।

দুধওয়ার কাছেই সিহাওয়া গ্রামের কাছে রুদ্রমুনির পাহাড়ে মহানদীর উৎপত্তি। ছোট্ট এক কুণ্ড থেকে বেরিয়ে মহানদী জন্মের ঠিক পরের মুহূর্তে যেন কি ভাবে বিশাল, বিস্তৃত হয়ে গেছে। নদী তো আর মানবশিশু নয়। অন্য এক মতে ফার্সিয়া গ্রামের কাছে একটি জলকুন্ড থেকে মহানদীর উৎপত্তি। কুণ্ডটি পাহাড়ের ঠিক নীচে না হলেও পাদভূমিতে। ওখানে নাকি পড়েছিল রুদ্রমুণির ছুঁড়ে ফেলা চিমটে। তাই মাটি ফুঁড়ে নদী বেরিয়ে আসে।

মহানদীর জন্মস্থলের চারপাশের পৃথিবী বড় প্রাচীন ও মনোরম। রাজাদের রাজত্ব ঢেউ-এর মতন ওঠে আর ভাঙে। দেবতার মহিমা কীর্তন আর নিজেদের কীর্তি স্থাপনের ইচ্ছেয় তৈরি হয় নানা মন্দির, নানা শৈলীর স্থাপত্য ও ভাস্কর্য পুরোনো হয়ে ক্ষয়ে ধ্বসে, অরণ্যের আগ্রাসনে লোপ পেতে থাকে। সেই সব প্রত্নবিদদের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত অথচ প্রায় নিঃশব্দ, গভীর নদী কেমন অনায়াসে বহে যায়। রামায়ণ মহাভারতে উল্লিখিত এই অঞ্চলই দক্ষিণ কোশল, যেখানে হিউয়েন সাং পদব্রজে চীন থেকে এসেছিলেন। মহানদীর উৎপত্তি স্থলের দক্ষিণে সীতানদী অভয়ারণ্য, সমুদ্রতল থেকে সাতশো মিটার মতো উঁচু মানে বেশ বড়সড় মালভূমি। পূর্বে উদন্তী অভয়ারণ্য।

কত নদী কত ভাবে শাখা নদী অথবা উপনদী হয়ে বড় বড় নদীদের অঙ্গ থেকে জল নিতে নিতে অথবা তাদের সিঞ্চিত করতে করতে মালভূমির বুকে রচনা করেছে এক অমোঘ জলের জাল।

মহানদী অববাহিকার উত্তরে বিলাসপুর সংলগ্ন অঞ্চলের মালভূমির বুকে জন্ম নিয়েছে হাসদেও আর বাংগো নদী। পশ্চিম থেকে শিওনাথ নদী এসে শিওনারায়ণ বলে এক জনপদে মিশেছে মহানদীর সঙ্গে, ওখানে আবার উত্তর থেকে এসেছে জঙ্ক নদী। ছত্তিশগড় সীমান্তের খুব কাছে মাণ্ড এসে মিশেছে মহানদীতে। মহানদী যেন এক নেপথ্য সংগীত, তাকে ঘিরে দৃশ্যমান মঞ্চে কত জনের খেলা চলেছে।

সিহাওয়ার পথে

ধমতরী জেলার সদরে বসে থাকলে কোনও ফল হবে না। বড় নদীর ডেরা দেখতে গেলে দক্ষিণে যেতে হবে সিহাওয়ার পর্বতসংকুল অঞ্চলে। ফাল্গুনের সকালে তাই চলেছি সিহাওয়া। এখনও বাতাসে তাপ জাগেনি, ভোরের দিকেই ঈষৎ শীতভাব অরণ্য সন্নিহিত অঞ্চলে। ধমতরী ছেড়ে দক্ষিণের পথ ধরলে প্রথমে পড়বে সমতল কৃষিভূমি। ছোট ছোট গ্রাম, যেখানে সেচের জলে ফলেছে দুনথর ধানের ফসল। টিপি করে ধান রাখা গৃহস্থের আঙনে, গরু চরছে ক্ষেতের পাশে, জড়ো করে রাখা খড়ে। লোকালয় ফুরোতেই আরম্ভ হয়েছে পর্নমোচী বৃক্ষের বন। সব গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যাওয়ায় বনের রং সাদা রূপালি, পিঙ্গল, ধূসর —এখানে আছে কত শত সেগুন, জঙ্গলকুর, মহুয়া, সেনহা, আমলকী, হরিতকী, বহেয়া ও মোয়েন আরও কত পর্ণমোচী গাছ। মোয়েন গাছ আগে দেখিনি। স্থানীয় নামের বঙ্গানুবাদ করার মতো কেউ ছিলেন না। মাঝে মাঝে ছোট ডিঙ্কামালীর ঝোপ, এরই সুগন্ধে বনের বাতাস ভরে যায় সন্ধেবেলা, বর্ষায় এই ঝোপে ফুল আসে। বনের প্রান্ত জুড়ে কেতকীর ঝোপ। কেতকী থেকেও সুগন্থি হয়, এ ছাড়া পাতা দিয়ে দড়ি। বর্ষায় এ জঙ্গল আবার ভরে যাবে নতুন পাতায়, ঠাসাঠাসি গাছে, নীচের আগাছার জঙ্গলে, বদলে যাবে বনের চেহারাই।

ধমতরী শহরে পেরোতেই বিশাল মহানদীর সঙ্গে দেখা। সে তো জানে না আমরা দক্ষিণে চলেছি তারই জন্মের গর্ভগৃহ দেখতে। যতই তার উৎসের দিকে যাব, ততই ঘন হবে অরণ্য, সব শেষে আসবে শাল জঙ্গল— চিরহরিৎ, সেই চিরহরিৎ বনই শিশুর নদীর খেলার সবুজ খিড়কি বাগান, পর্ণমোচী অরণ্যভূমির এক কোনায় দেখলাম রোদে দাঁড়িয়ে ঝলমল করছে একাকী কুসুমগাছ, কোনও কারণে এহাকার নিয়ম ভেঙে সে সেজে আছে সবুজ পাতায়।

পর্ণমোচী অরণ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল শেষ হলে আরম্ভ হয় মিশ্র জঙ্গল, সেখানে সবুজের ছোঁয়া লেগেছে নিরাভরণ গাছের সারির ফাঁকে। মাঝে মধ্যে গ্রাম পড়ে, এগুলি বনগ্রাম। কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে বনের মধ্যে বসবাস করতে করতে একটি ছোটোখাটো গ্রামের রূপ নেয়। এগুলি স্বাভাবিক রাজস্ব গ্রাম নয়, জনবসতকে স্বীকৃতি দিতে প্রায়শই প্রস্তুত হয় না। প্রশাসন। ছত্তিশগড়ে বনগ্রামগুলিকে রাজস্ব অঞ্চলের মতনই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, যেহেতু অরণ্যবাসী মানুষের সাহায্য ছাড়া অরণ্যকে রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। গ্রাম ও অরণ্য একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে আছে— জনসংখ্যা অতি অল্প, কোথাও দুশো, কোথাও তিন-চারশো।

মাঝে মাঝেই দীর্ঘ পাথুরে চট্টান। ঐ ভূমিতে জেগে ওঠে খদির বা খয়ের গাছ। খয়ের জঙ্গল তার ঝাপসা কালচে খয়েরি চেহারা নিয়ে

আসন্ন দুপুরের রোদে পুড়ছে। এদেশে খয়ের কে বলে 'কহ্যা'। থালের বিতর কে কাণ্ড , তার কাঠ থেকে খয়ের হয়। বাকলের উপর কত আঁকিবুঁকি ফাটাচটা, আঙুল বোলালে শিরশির করে ওঠে শরীরের ভিতর।

পর্ণমোচীর নিয়ম ভেঙে যেমন কুসুম দাঁড়িয়ে আছে, দেখা গেল জামগাছের কয়েকটি নিয়ম ছাড়া তলও। জাম চিরহরিৎ গাছ। বনের মধ্যে জামগাছ মানে ওখানে ভুগর্ভের জলতল উপরে। অর্জুনগাছেও নাকি জন্মায় জলপ্রবাহের ধারে ধারে। অর্জুনগাছ মানেই কাছাকাছি নদী আছে বা জলস্রোত। অর্জুন ও কুসুম এই দুই গাছই বনবাসী মনুষের জীবন বদলে দিতে পারে— অর্জুনগাছে তসর পোকা গুটি বাঁধে, কুসুমগাছে হয় লাক্ষা। দুই বনজ সম্পদ। খয়ের বনের মধ্যে বল্মীকের ঢিপি বড় বড়। এ সব নাকি ভালুক-চরা বন। মধু আর উইপোকা খেতে ভালোবাসে ভালুক, আমাদের যেমন আচার বা রসুন, তেমন উইপোকা খেলে ভালুকের টাক্‌রায় স্বাদ আসে।

মিশ্র জলে অনেকটা ঘন ও জটিল, গাছে গাছে লতা, পাতা ও গুল্মের সমাহারের জন্যই। গাছগুলিও দীর্ঘ ও সবল ফাল্গুনের রোদ জড়িয়ে গেছে তাদের গাছে। অরণ্যের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ে, তারপর আরম্ভ হয় চিরহরিৎ শালের বন— পথের দুপাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়াঘন অরণ্য, পাতা উড়ে সবার ঝরে পড়ার ফিস্‌ফিস্ শব্দ। দুগলী ছাড়িয়ে সীতানদী অভরায়ণ্যের সীমার ভিতর ঢুকে পড়ছি। বনের প্রান্তে খড়ের ঝুপড়ি ঘরে বসে থাকে অগ্নিরক্ষণ বা ফায়ার ওয়াচারার। তিন মাস, ফেব্রুয়ারি থেকে মে— এই বৃষ্টিহীন তিন মাসই তারা কাজ পায় বনবিভাগের কাছ থেকে, মাসে তিন হাজার টাকা উপার্জন। তাদের কাজ হল, গ্রামের কেউ ইচ্ছে করে জেনেশুনে আগুন না লাগায়, তা দেখা। যদি আগুন লেগেও যায়, তা তাড়াতাড়ি নিভিয়ে ফেলতে হবে বনসৃজন সমিতির লোকজন ডেকে। ধম্‌তরী জেলার বনসৃজন বা বনরক্ষা সমিতিগুলি বেশ প্রাচীন, ব্রিটিশ আমল থেকেই আছে। তাদের সঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্যদের মেলামেশা বেশ ভালোরকম। বনের মধ্যে আটফুট চওড়া এক ফাঁকা করিডর রাখা হয়। আগুন যাতে পাশের দিকে বাড়তে বাড়তে পুরো অরণ্যকে গ্রাস করতে না পারে। থমকে যেতে বাধ্য হয়। মহুল কুড়োতে আসে গ্রামের মেয়েরা, তাদের হাতে সময় কম, তাই সব সময় তাড়াহুড়ো। গাছের তলা ঝেঁটাতে সময় লাগে অনেকটা, তাই তারা চট করে আগুন লাগিয়ে মহুলগাছের নীচেকার ঘাস পুড়িয়ে কালো করে দেয়। পোড়া কালো ঘাসের উপর মহুলের সোনালি-হালকা সবুজ বর্ণ চেখে পড়ে চট করে, কুড়োতে আরাম। এই সব মেয়েদের ভয় দেখিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাখতে হয় অগ্নিরক্ষককে।

এত সব দেখাদেখি সত্ত্বেও বনে এবার আগুন লেগেছে বেশ ক'টি কম্পার্টমেন্টে। বনকে নানান কম্পার্টমেন্টে ভাগ করেছে বনবিভাগ। গাছ পোড়েনি অবশ্য কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ঘাস। ঘাসের সঙ্গে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ভূমিতে পড়ে থাকা বীজ, লতাগুল্ম, পড়ে থাকা ঝরা পাতা যা বৃষ্টির জলে পচে পরিণত হতে পারত সারে। অরণ্য তার ত্বক, পিঠ, বুক সব কিছুর পরতে - পরতে জমিয়ে রাখে নানা সম্পদ— অসময়ের জন্য। কত মধু, কত কেন্দু পাতা, কত লাক্ষা, কত তসরগুটি, ওষধি, লতাগুল্ম, জ্বালানি কাঠ, ঠোঙা তৈরির জন্য পাতা, কত সুগন্ধ, পাখির বাসার জন্য কোটর, নানা ফুল, ফল, গঁদ, মধূর চরা নির্মল তৃণভূমি, বণগ্রাম... কত শত মানুষের জীবন, জীবিকা, বেড়ে ওঠা...

সাতটি পাহাড়ের এক মালা—তারই মধ্যে একটি মহেন্দ্রগিরি। ওখানে ছিল শৃঙ্গী ঋষি বা ঋষ্য শৃঙ্গর আশ্রম। সাতটি পাহাড়কে সপ্তঋষি বলেই মানে স্থানীয় মানুষ। মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ের উপর দাঁড়ালে বর্ষার ঋতুতে দেখা যায় ঘন সবুজ বিস্তৃত ধানক্ষেত, অন্যান্য, পাহাড়, দূরের জঙ্গলে - সেও সবুজ। বর্ষার আগে এখনও মাটি রুক্ষ ও ধূরস। অরণ্যও সেও পিঙ্গল ধূসর— তবু পাহাড়ের উচ্চতা থেকে দেখা পৃথিবীর বিস্তারের দৃশ্যে মায়া আছে। পাহাড় কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে, মাঝে মাঝে বসার ছাউনি। পাহাড়চূড়ায় নারকোল ও পূজা উপকরণের ক'টি দোকান, তারপরই মুনির মন্দির। মন্দির চত্বরে ছোট এক পাথুরে কুণ্ড— দশ বারো লিটারের বেশি জল ধরে না তাতে। এক সময় নাকি আপনা থেকেই জল উঠে ভরে যেত কুণ্ড, এখন আর ভরে না। ঋষির কমন্ডুল সম্ভবত এই স্থলেই পড়েছিল— এমনই লোকপ্রবাদ। পাহাড়ের ঠিক নীচে মহানদী ছোট এক নালার মতো। সিঙ্গাওয়া গ্রামের কাছে ঈষৎ চওড়া হয়েছে নদী— তবে খাতে জল কই। শুনলাম, উৎপত্তির পর একশো কিলোমিটার পর্যন্ত নদী সদাবহতা নয়। জল থাকে জুন থেকে নভেম্বর। মাঝে বাঁধ দেবার ফলে জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ থাকে, পরিমাণে কম পড়ে। একশো কিলোমিটার পর অবশ্য নদীতে সদাসর্বদা জল কটকের কাছেও মহানদীর দু কিলোমিটার বিস্তৃত খাতে ধু ধু চড়া। এত বড় খাত কি করে হল এই নদীর— জলমগ্নের পর থেকেই, জন্ম বাসা ছাড়ার পর থেকেই— এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পেলাম না।

প্রবাদ আছে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি নাকি মহেন্দ্র গিরিতে বসে ধ্যান করছিলেন, পাশে কমন্ডুলুতে রাখা ছিল মহাকুন্ড থেকে আনা জল। বাতাসের দমকা তোড়ে কমন্ডলু উলটে জল পড়ে বইতে থাকে ধারা। যতক্ষণে ঋষি চোখ খুলেছে, জলের সরু ধারা বিশাল হয়ে দৌড়ে চলেছে পাহাড়ের নচীতে । তার তোড়ে ভেসে বয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার। কেউ বলে ধ্বংসের এই ভয়ানক ছবি দেখে জলধারাকে থামাতে মুনি হাতের চিম্‌টে ছুঁড়ে মারেন, চিমটে গিয়ে পড়ে পাহাড়ের পাদদেশে ফার্সিয়া গ্রামে, যেখানে এখন একটি কুন্ড আছে, যাতে সারা বছর জল থাকে। অন্য মতে ঋষি আদেশ করেন জলধারাকে থামতে, নইলে তাকে আবার ভরে নেবে কমণ্ডুলুতে— বন্দিত্বের ভয় পেয়ে জল রাজি হয়ে গতিপথ বদলাতে। ক্ষেত খামার, জনপদ ছেড়ে সে বইতে থাকে বিজন অরণ্যের মধ্য দিয়ে। মহানদী শান্ত হয়। তার জলস্রোত আনে উর্বর পলি, জলবাণিজ্য আরম্ভ হয় নদীর গতিপথে। নদীর নাম তাই হয় রত্নগর্ভ; চিত্রোৎপলা নামেও ডাকে অনেকে। উৎপত্তির পরেই তাঁর বিপুল বিস্তার। তাই নাম মহানদী। অন্য মতে শৃঙ্গী ঋষির প্রিয় শিষ্য মহানদের নামে নদীর নাম।

মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ের উপর থেকে দেখা যায় নীচের দিগন্ত বিস্তৃত সমতল। বর্ষার সব ক'টি ক্ষেতে যখন ফসল রোয়া হয়ে যাবে— সবুজের নানা জ্যামিতিক ক্ষেত্র এক গালিচা তৈরি করবে চাষিদের হাতে বোনা। মহেন্দ্রগিরি পাহাড়ের মাথায় যেমন শৃঙ্গী ঋষির আশ্রম, সাতটি পাহাড়ের মালাকে বলা হয় সপ্তর্ষি মণ্ডল। তবে নক্ষত্রমণ্ডলীর নামে নয় এ সপ্তর্ষি মণ্ডলের নাম। ঋষিদের একটি করে আশ্রম— প্রতি পাহাড়ের মাথায়। অগস্ত্য, অঙ্গিরা গৌতম, কঙ্ক, মুচকুন্দ, শর্ভঙ্গ— পুরাণে নাকি তাঁদের সবার উল্লেখ আছে।

ফাল্গুনের ঈষৎ তপ্ত দুপুরে মহেন্দ্রগিরির মাথায় দাঁড়িয়ে কল্পনা করেছিলাম, আষাঢ়ের মেঘ যখন সাতটি পড়শি পাহাড়ের মাথায় ঘনায়, তখন কেমন দেখায়। পাহাড়ের পায়ের কাছেই ছোটধারায় নদী বয়ে গেছে। একটু এগিয়ে ফার্সিয়া ছাড়িয়ে সদাবহতা জলের কুণ্ড টিও দেখে

এলাম। গাছের ছায়ায় টলটল করছে জল, কাছেই দুর্গা মন্দির সংস্কারের কাজকর্ম হচ্ছে, কংক্রিট মিক্সিং -এর কাজ চলছে ঘরঘড়িয়ে। কুন্ডের ঠিক পিছনেই আ-চষা ধানক্ষেত। জলধারা ওরই মধ্যে দিয়ে এসে কুণ্ডতে পড়েছে। অন্য এক মতে এখানেই ঋষির ছোড়া চিনটে পড়েছিল, তাই নদী এই পর্যন্ত এসে আবার ঘুরে গেছে। এত বছর পর এক নদীর জন্মের অব্যবহিত পরের পথ বদলানো। অতি শীর্ণ ধারা থেকে হঠাৎ বিস্তীর্ণ নদীখাতে বয়ে যাওয়ার ইতিহাস মাটির বুক চিরে বার করা যায় না। তবু মায়া জাগে। যে নদীকে ওড়িশায় এ ভাবে দেখেছি হীরাকুদে। বৌদ্ধ জেলার দ্বীপে, শোনপুরে, টিকরপাড়ার অরণ্য ঘেঁষা গিরিখাতে, নয়াগড়, জগৎসিংপুর, কটক পারাদীপের সমুদ্র মোহনায়; সীতানদী অভয়ারণ্যের উত্তরপ্রান্তে, এইখানে সিহাওয়া পর্বত ও তৎসংলগ্ন ফার্সিয়া নামক ছোট গ্রামে তার জন্মচিহ্ন দেখে অলীক এক বিপরীত যাত্রার অনুভূতি হয়।

সিহাওয়ার সামান্য দক্ষিণ পূর্বে কাঁকের -এর ঠিক দক্ষিণেই জগদ্দলপুর, বস্তার। মাওবাদীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের এলাকা। আমাদের ফিরে আসা ক'দিন পরেই কাঁকের -এর মাইনপাতা জঙ্গলের রাস্তায় পুলিশের গাড়ি অ্যাম্বুশ্ড্ হল। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলে, ওড়িশার নিয়মগিরি পর্বত অঞ্চল, ঝাড়খণ্ডের সিংভূম, রাঁচি, পালামৌএর বিস্তীর্ণ এলাকা, ছত্তিশগড়ের বস্তার, মহারাষ্ট্রের গড়চিরোলি— এই আজকের 'রাঙা' করিডর— যেখানে নব্যউদার পুঁজির বিপুল ট্যাংকের মিছিল মাড়িয়ে থেঁতলে এগিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক জনজীবন। মহানদীর আঁতুড়ঘরও এই লাল করিডরের গা ঘেঁষা বলা যায়।

ফেরার পথে দুগ্লী রেঞ্জ-এর জঙ্গল বাংলোয় তুলারাম -এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুগ্লী পেরিয়েই সীতানদী অভয়ারণ্য অঞ্চল। দুগ্লীর বাংলোটি একশো বছরেরও বেশি পুরানো, তার হাতায় অজস্র বড় বড় তেঁতুল, অর্জুন, নিম ও আমের গাছ। অরণ্য যেন একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, জনপদকে ছায়া দেবে বলে।

আমি তুলারাম ধুরু, পিতা পহাঙ্গুরম ধুরু, গোঁড়া, আদিবাসী, বৈদ্যরাজ বলে জানে আমাকে লোকে।

গোঁড়াদের আর কি পদবি হয়, জানতে চাওয়ায় সস্তা গোঁফের ফাঁকে প্রশান্ত হাসলেন, কিছু হয় না, আজকাল সবাই পদবি জুড়তে লেগেছে, আমার বাপদাদা, আমি চিরকাল গোঁড়াই বলতাম— এতকাল বলে এসেছি।

তুলরামের বাড়ি সিহাওয়ার চন্দনবাহারা গ্রামে, মহানদীর উৎস ফার্সিয়া থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। সন্দুর নদীর ধারে। তুলারামের উচ্চারণে সন্দুর অবশ্য শোনাচ্ছিল 'সুরু' নদী, বৈদ্যরা মহানদীর অববাহিকা ও সীতানদী অরণ্যের গাছ-গাছড়া চেনে, তাদের গুণ জানে, জঙ্গল বিভাগের লোকেদের সঙ্গে ঘুরে সে-সব তোলায়, কি ভাবে রাখতে হয়, ছায়ায় না ঘামমে- (মানে রোদে), তা বাতলায়, ওষুধ বানানোর পদ্ধতি জানে। তুলারামের মতো এই জঙ্গল অঞ্চলে আরও ত্রিশ-চল্লিশ জনও বৈদ্য আছে সাঁকবার রেঞ্জ অফিসে একটা ঘরে গুঁড়ো, সিদ্ধা বাটা এই সবের যন্ত্রপাতি আছে। সেখানে ওষুধ বানায় বৈদ্যরাজ তুলারাম।

মোটাসোটা মানুষ, মাথার পিছনে টিকি, সাদা গোঁফ, গায়ে গোলাপি কুর্তা, আঙুলে টাইগারস্টোনের আংটি, প্রসন্ন আনন্দিত চেহারা।

দু-তিন একর চাষও আছে, এ ছাড়া মৃগী রোগের চিকিৎসায় ভালো নাম তুলারামের। ধান হয়, গ্রীষ্মের আগে পাম্পের জলে গমের আরও এক ফসল। মোটরবাইক কেনা হয়েছে এক বছর আগে, তার পিছনে বউকে বসিয়ে ঘুরতেও যান, বলে মিটমিটি হাসছেন নিজের।

এ অঞ্চলে এক চাষও আছেন আদিবাসী নন এমন সব সম্প্রদায়। কামার, সাহু (এরা বীজের তেল বার করেন), এগারচী, মিসাদ (নাপিত) কেওট (মাছ ধরিয়ে) যার, সতনামী - তবে গোঁড়ারা জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, আদি সন্তান অরণ্যভূমির।

অরণ্যকে অতি নিবিড়ভাবে জানে তুলারাম। এর ডানার খাঁজে, কোটরে লতাগুল্মের বনে বেড়ে ওঠে কত রকম ওষধি। শতাবরী, অর্শগন্ধা, শালপর্ণী তেজরাজ, ভোজরাজ, কামরাজ, অনন্তমূল, কেকরাসিঙ্গী, জটা মাংসী, বাক্ বৌড়া, দুধি, সেহ্নী, গুর্মার পত্তি— শতবরী হল অ্যাসপারাগাস, অর্শগন্ধায় চিকিৎসা হয় স্নায়বিক উদ্বেগের, শালপর্ণীচে গেঁটেবাত আর ক্যানসারের ওষুধ, গুর্মার পত্তিতে সারে মধুমেহ, তেজরাজ, ভোজরাজ— স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। অনন্তমূলে ভালো হয় পেটের ব্যাথা, শ্বেতপ্রদর। কেকরা সিন্দীতে সারে সাধারণ বাত, বোক্ চৌড়াতে ঝিনঝিনি, গাঁটিয়া (গেঁটে) দুরকম বাতই।

জঙ্গলে আছে নানা রকম পশুপাখি; সাপই কতরকমের— ওষধি খুঁজতে গিয়ে সাপেদের স্বভাবচরিত্র জানা হয়ে যায়, তুলারাম বলছিল। নাগিন, শুঁড়িয়া, অজগর, পাহাড়চিত্তি, খড় দাঙিগয়া, রোক চক্কি। শুয়া সাপ তো আবার ওড়ে। কুক্রী, নীলকণ্ঠ, টেহরী, গিধরী, রাওলা, চেটিয়া, মঞ্জুর-ছুরিয়া—কত পাখির পাখার রং ও ডাকাডাকিতে রঙিন হয়ে থাকে অরণ্য। এ ছাড়া তুলারাম দেখেছে ভুলু, বাঘ, চিতল, হরিণ, সামার (শম্বর) বনউঁইসা, গাওয়ার; সুঁঅর, বেন্দরা (বাঁদর), জংলি বিল্লিদের মতো ছোটোখাটো জানবর। কুমির বা মগর মাছের সন্দুর নদীতে— আর হ্যাঁ, সুন্দরের জঙ্গলে আছে সাল্খপরি বা পিপীলিকাভূক্—

ছত্রিশগড়িয়া বুলিতে কথা বলছিল তুলারাম, ভোজপুরির সঙ্গে কিছু মিল আছে ধ্বনিতে, সীমান্তের এ পারে নুয়াপাড়া অঞ্চলের লোকের মুখেও ছত্তিশগড়িয়া লহরিয়া বুলি শুনেছি।

ছত্তিশগড় নতুন রাজ্য হওয়াতে তুলারাম খুশি। দুই-আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ভোপাল যাওয়া তাদের সাধ্যে কুলোত না। আর তাদের কথা শোনার জন্য রাজধানী থেকে আসবে? এখন একবেলার মধ্যে ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুর গিয়ে আসা যায়। খরচও তেমন নয়।

গোঁড়দের ছেলেমেয়েরা এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। শিশুরা অঙ্গনবাড়িতে, আদিবাসী হস্টেল হয়ে দূর-দুরান্তের ছেলেমেয়েদের ও সুবিধে হয়েছে পড়াশুনার। তলে তিনটাকা কিলো চালের অঢেল যোগান হয়ে এদের জীবনযাত্রা বদলেছে। গোঁড়রা আজকাল বড় একটা দূর গ্রামে কাজ খুঁজতে যায় না। আরাম হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে, পাল-পার্বনে চালের অপর্যাপ্ত যোগান কাজে লাগে। তবে মহুলের মদ, দোকানের মদ খাবেই সন্ধেবেলা, খেয়ে বাড়িতে ঝগড়া, মদ না থাকলে কিনে এনে খাবে— এই অশান্তি কিছুতেই যাচ্ছে না।

চারপাশে জঙ্গল বিভাগের লোকজন ছিল বলে তুলারাম অবশ্যই বিশ্লেষণে যায় না। সস্তার চাল, স্কুল হস্টেল—সবকিছু সু সত্ত্বেও আদিবাসী গোষ্ঠীবদ্ধতায়, আত্মনির্ভরতায় ফাটল ধরেছে বহুদিন হল। খনি ও শিল্পের নামে তাদের উৎখাতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আদিবাসির

হয়েছে বিকল্পের সংকট— পিছু হটলে মাওবাদী নামের ছ্যাঁকা, এগোলে সাহওয়া জুড়ুম। এক অঙ্গ দিয়ে অন্য অঙ্গকে প্রহার করানোর মতো সালওয়া জুড়ুমে সামিল করানো হয়েছে আদিবাসীদের এক অংশকে। প্রতিবাদে অরণ্যে বেড়েছে হিংস্রতা— বস্তারের অরণ্য পথে ল্যান্ডমাইন, সি আর পি এফ্-এ বিপুল বাহিনীকে নির্মমভাবে শিকার করে মাওবাদীরা আক্রমণ করেছে পুলিশদলে যোগদান করতে যাওয়া তরুণদের বাসও। সীতানদীর অভয়ারণ্য থেকে বস্তার দূরে নয়। তার ওষধি এ সব সংকট কাজে লাগে না। কে কার সঙ্গে কথা বলবে? অগ্রসরমান শিল্প ও খনিজ উত্তোলনের পুঁজির সাথে মিলে-মিশে গেছে রাষ্ট্রের কণ্ঠস্বর। মদ খেয়ে বাড়িতে মারধর বিশৃঙ্খলা—গোঁড়দের অস্তিত্বে মাটির নিচেকার আগুনের তাপের আঁচ।

রাজিম

জেলাশহর ধমতরী ফেরার পথে অভনপুর হয়ে গেলাম রাজিম। এক ছোটোখাটো গঞ্জ শহর। ঘেঁষাঘেঁসি ঘরদোর, পরিকল্পনার বালাই নেই, পথের ধারে ধারে আবর্জনা। অভনপুর থেকে ধমতরী ঘন্টাখানেকের পথ, সেখান থেকেই হাইওয়ে ছেড়ে রাস্তা গেছে রাজিম।

মহানদীতে এখানে এসে মিশেছে সন্দুর-তুলারামের বাড়ির কাছের সেই নদী আর ছোট এক নদী—পিয়ারী। বর্ষায় এই তিন ধারাই নাকি স্পষ্ট দেখা যায়।

এইটুকু জায়গাতেই দু-রকম মত পেলাম—একজন বলল পিয়ারী নদী এখন লুপ্ত, অন্যজন বলল, পিয়ারী আছে ওই বালির মধ্যে মিশে, সুন্দর নদীই লুপ্ত। বাস্তব এই যে ধু ধু নদীখাতে এক ছিটেও জল নেই, কেবল বালি, দিব্যি তরমুজের চাষ হয়েছে বালিতে, রাজিমের তরমুজের নাম আছে। চালক বলল 'প্রচলিত', ট্রাক্টরে করে নদীর বালি তোলা হচ্ছে, তাতে পাতলা আস্তরণ ফুটে জল দেখা যাচ্ছে, চাষে এ জল নিশ্চয়ই লাগে। কোথাও দূর থেকে নতুন মাটি এনে ঢালা হচ্ছে, তার উপর চাষ হবে। জল না থাকা মাসগুলির এক বিকল্প ব্যবস্থা। কিছুদিন হল রাজিম কুম্ভ শেষ হয়েছে। গত তিন বছর ধরে কুম্ভ হচ্ছে। হিন্দু জাগরণের এই পরিকল্পনা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও ছড়ানোর জন্য গুজরাত, ছত্তিশগড়ে কুম্ভ আয়োজন করা চলেছে। নদীর বুকেই ফুলেশ্বর মহাদেবের মন্দির আর রাজীবলোচন মন্দির। এখন জল নেই। মেলার জন্য নদীর বুকে রাস্তা তৈরি হয়েছে মন্দির পর্যন্ত। মেলার যাত্রীরা চলে যাওয়ার পরও এখনও নদীচর পরিষ্কার হয়নি। উনুনের ছাই। চাটাই, আবর্জনা, প্লাস্টিকের ঠোঙা সব পড়ে আছে এখানে ওখানে। অপরিষ্কার। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় ফুলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। বিশাল অশ্বত্থ তার পুষ্ট ডালপালা ছড়িয়ে ঢেকেছে পুরানো মহাদেব ও মা-দুর্গার মন্দির। একটি নিচু ডালে ভক্তরা সবাই মানসিকের জরির ও সিল্কের ফিতে বেঁধেছে। ডালটিকে দেখাচ্ছে বঙচঙে রাঙা ঝলমলে সোনালি। অষ্টম-নবম শতাব্দীর মন্দির। পুরানো শিবলিঙ্গ, প্রাচীন রামসীতার মূর্তি, তার উপর সাদা রং করা নতুন মন্দির দাঁর করানো হয়েছে। তবে তারও তিন চারশো বছর হল। পূজারি বলল, সন্ধেবেলা ফুল বেলপাতার স্তূপ ধুয়ে দেখা যাবে শিবলিঙ্গ পঞ্চমুখ। গ্রামাঞ্চল থেকে ভেসে আসা একটি পরিবার বড় বারকোশে কী প্রসাদ সাজাচ্ছে, ঢিপি করে। মাছি ভনভন করছে তাতে। আঢাকা প্রসাদ ওরা চাতালে রেখে কোথাও চলে গেল। প্রাচীনকাল থেকেই অবশ্য ছোট্ট একটি মন্দির ছিল, পাথরের। সিঁড়ি দিয়ে নেমে উলটো দিকে মহানদীর বুকেই রাজীবলোচন মন্দির। বিষ্ণু শিবের পূজা করছিলেন ১০৮ টি পদ্মফুল দিয়ে শিব বারবার একটি পদ্ম লুকিয়ে রাখছিলেন উপচারের ত্রুটি বার করার জন্য। তখন 'রাজীবলোচন' বিষ্ণু তাঁর নয়ণ উৎসর্গ করেন ১০৮ তম পদ্ম হিসাবে। মন্দির ট্রাস্ট যদিও আজ অর্ধশতক ধরে চূড়া ও মন্দিরের গা চুনকাম করে সমান সপাট করে দিয়েছে, তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না কী অপূর্ব সুন্দর এই প্রাচীন মন্দির। থামগুলি, দেওয়ালে গাঁথা কুটীল সংস্কৃত ও দেবনাগরীতে লেখা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া শিলালেখ, গর্ভকগৃহের দ্বারে গরুড়ের পিঠে চড়া উড্ডীয়মান বিষ্ণু, যক্ষিণীরা, পরস্পরে লিপ্ত সাপ ও লতাগুল্মের কারুকার্য। সে কী দূরন্ত ও নিখুঁত। ভিতরে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি। এঁর নাম হরি। ঠিক বিপরীতে মুখোমুখি 'হর' বা শিবের মন্দির। সর্বত্র ভনভন করছে মাছি। দাঁড়ানো যায় না, এত অপরিষ্কার। হর মন্দিরটি ছোট ও নিচু, তবে এখানেও থামগুলি প্রাচীন ও কারুকার্য মন্ডিত। পুরাতত্ত্ব সার্ভের কমীটি বলল, ঐ পুরানো চুনকাম তুলে প্রাচীন মন্দির বার করে আনার কথা হয়েছে, কবে হবে জানা নেই।

রাজীবলোচন মন্দিরে ঢোকার ঠিক আগেই একটি শিবমন্দির আছে, সেখানে রাজিমের মূর্তি আর এক শিলাচিত্র। কে রাজিম? সে এক তেল-নিষ্পেষক কুলের নারী, একদিন হঠাৎ তার তেলপাত্র ভেঙে সব তেল পড়ে যায় বলে রাজিম কাঁদছিল আর ভগবানকে ডাকছিল। ফলে দেবতা তার ঘরের এক শিলায় উজ্জীবিত হন এবং এমন উদার হাতে তেলের পাত্রটি ভরে দেন যে ঘরে তেল রাখার জায়গায় থাকে না। এ শিলাপাথরটি কিনতে চান রাজা, রাজিম তাতে রাজি হয় না। শেষে পাথরে অবতীর্ণ ভগবানের নামে যখন রাজা মন্দির গড়েন, তখন সম্ভবত দরিদ্র রাজিম হারতে বাধ্য হয়, শিলা পাথরটি চলে আসে মন্দিরে। রাজিম কেবল একটি শর্ত দেয়, আমার নামও জুড়ে নাও ঐ সঙ্গে। তাই মন্দিরে রাজিমের মূর্তি, শহরের নামও তার নামে। ঐ শিলাখণ্ডটি আজও রাখা আছে, তেল মাখানো, (এখনও এখন কেন কে-জানে!) এবং ওর উপর মুদ্রা রাখলে আটকে যায়, এমন জনশ্রুতি। ভক্তরা পরীক্ষা করে দেখেছে। আটকেও যাচ্ছে কয়েকটি মুদ্রা।

মন্দিরের বাইরে অস্থায়ী চালা বেঁধে প্রসাদ, ফলের চুবড়ি, নারকোলের পসরা, মালা, শিবলিঙ্গ, নন্দী ষাঁড়, ফটো এসবের দোকান, শিবমন্দিরের বাইরে যেমন হয়। একটি মাত্র ভিখারিণী বসে, হয়তো যাত্রী কমই আসে। ভনভনে মাছি নাকে মুখে লাগছে।

অডনপুর থেকে যে রাজপথ ধমতরী হয়ে রায়পুরের দিকে গেছে, সেখানে মাটি উঁচু, চাষের জন্য সেচের জল নেই। কারণ ধানকাটা খেতগুলি হলদেটে মাটিতে মালো ছাই, আগের ফসল পুড়িয়ে চাষি হয়তো নতুন কিছু বুনবে। আলের বুকে বাব্লার গাছ, মাঝে মাঝে পলাশ, বিষণ্ণ ঊষর জীবন-যাত্রা।

পলাশ নাকি নিবিড় অরণ্যের গাছ নয়। তুলারাম বলছিল, যেখানে ক্লিষ্ট বা নষ্ট অরণ্যভূমি সেখানেই পলাশ জন্মায়। মহানদীর গর্ভগৃল সন্নিহিত অরণ্য অঞ্চলে নানা রঙের পলাশ ফোটে, লাল, গাঢ় কমলা, এবং বিরলতম হলেও শ্বেত পলাশ। তবে তা অরণ্যের প্রান্তে সীমারেখা ধরে। শিমুলেরও তেমন দু-তিন রকম রং, লাল, কমলা, গাঢ় লাল...সন্দুর বাঁধ সংলগ্ন পাহাড়শ্রেণির এক ঢালে দাঁড়িয়ে তুলারাম আমাকে

সীতানদীর অরণ্য দেখাচ্ছিল— সুন্দরের জলভাণ্ডার হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে কত পশু পাখি প্রজাপতি সরীসৃপের আশ্রয়, চাষের জল পেতে গেলে মানুষকে এই ভাবেই কি আশ্রয়চ্যুত করতে হবে উদ্বিদ ও প্রাণীদের? ঈষৎ বিষণ্ণ ভাবেই তুলারাম বলছিল, এখন কি আর আসার সময়, এখন জঙ্গলে তেমন নেশা কই?

ফাল্গুনের অরণ্য যদিও, তবু, চিরহরিৎ শাল বাদ দিলে সবুজ তেমন চোখ টানেনি তো। পর্ণমোচী বন কেমন কালচে ধূসর। মাঝে মাঝে দু একটা কুসুম গাছ, রাঙা হয়ে আছে বসন্তে, সন্দুরের বাঁধের কাছেও কেবল রাঙা কুসুমও পলাশের মেলা—যেন অরণ্যে সিঁথিতে আগুন ধরে গেছে। বন যত গভীর হয়, তার প্রান্তে তত সাজে আগুন পতাকার মতো পলাশ। পিঙ্গল ভরা পাতার উপর কত যে নেভা কমলা পলাশ, তাদের খয়েরি স্মৃতি নিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে আছে।

এখন সবুজ কই, তুলারাম বলেছিল, বর্ষায় এসো, তোমাকে সবুজ অরণ্য দেখাব, আর বান...

চন্দনবাহারায় আমাদের গ্রামে সুন্দরের ধারে বসে থাকতে থাকতে দিনমানে শুনবে ঝিঁঝির উদ্দাম ডাকে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে দুপুর, বন ঘন সবুজ, পাতায় পাতায় ও নীচের গুল্ম আগাছায় ঠাসাঠাসি বন, ঘনবৃষ্টির ফোঁটা, তার চিৎকার, আর মালভূমির বুকে শত দিক থেকে ধেয়ে চলেছে পিঙ্গল জল, পাহাড় বেয়ে, উঁচু জমিতে পথ কেটে বেয়ে চলেছে নামহীন জলধারা ও নামধারী নানা নদী— শিশু নারায়ণ, জঙ্ক, আরও কত উপশাখা মহানদীর, কলকলানো সেই জলের শব্দে বন ডেগে ওঠে, রাজিমের কাছে মহানদী কূলপ্লাবী হয়ে যায়, কোথায় হারিয়ে যায় তার ধু ধু গ্রীষ্মের বালুচর অদৃশ্য তখন; গঙ্গারেল সুন্দর, মরমশিনী জালভাণ্ডার ফাটো ফাটো, তাদের জলস্ফীতি নজরে রাখতে হয় দিন রাত—আসতে হয়, তো ঐ সময়, তখন এসো...

তুলারাম কিছু কিছু শেখাতে চেষ্টা করেছিল আমাকে, অরণ্য সম্বন্ধে...

বলেছিল, বাঘ স্বার্থপর। আর সিংহ সামাজিক। সিংহ শিকার করে কেবল নিজের পরিবার ও সন্তানদেরই দেয় না, অন্য পরিবারের সিংহদেরও দেয়।

ঘন  বনে সিংহ থাকে না। থাকে পর্ণমোচী অরণ্যে, যদি যেখানে উপযুক্ত সুরক্ষা বলয় থাকে। পর্ণমোচী বনের ধূসর কালো পিঙ্গল রূপ সিংহের বসতভূমির উপযুক্ত।

বালি আর মাজা গাছের তফাত ধরতে পারিনি। তুলারাম আমার হাত ধরে শিখিয়েছিল, শালের বাকলে উল্লম্বরেখা, আর সাজার বাকল কুমীরের চামড়ার মতন, নইলে এই দুই জাতির গাছই দেখতে একরকম।

আর একটা অদ্ভূত কথা বলেছিল তুলারাম — মোয়েন গাছের কাঠে নাকি দুটো জিনিস হয়; শিশুর খেলনা, আর বন্দুকের বাঁট...

আবার বর্ষায় যদি দেখা হয় চন্দনবাহার, ততদিনে আরও রক্তপাত হয়েছে কাঁকের ও তার সন্নিহিত অরণ্য অঞ্চলে, খেলনাকে বন্দুক আর বন্দুককে খেলনা বানাতে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়েছে মৃত্তিকার সন্তানদের জীবন, তাদের বাসগৃহ অরণ্য নষ্ট হয়েছে, হয়তো তুলারামকে এসব কথা বলা যাবে না। কেবল আষাঢ়ের গর্জমান মহানদী দেখেই ফিরে আসব।